কাজী মু'তাসিম বিল্লাহর অভিমত— '৭১-এ যারা প্রাণ দিয়েছে তারা শহীদ, বিরাঙ্গনারা মজলুমা

তথ্যটা দিলেন এক লেখক বন্ধু। বললেন, তার কাছে কয়েকজন আলেম মুক্তিযোদ্ধার সন্ধান আছে। অবাক করার মতোই তথ্য। আলেম মুক্তিযোদ্ধা! কে তারা? একে একে চার-পাঁচজনের নাম বলে গেলেন। আরও বলতে চাইলেন। তাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, যারা জীবিত আছেন তাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে চাই।

সোজা রওয়ানা হলাম মালিবাগের উদ্দেশে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সময়ের খণ্ডকালীন শিক্ষক, বিশিষ্ট লেখক, সাহিত্যিক ও বর্ষীয়ান আলেম এবং জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগের বর্তমান প্রিন্সিপাল মাওলানা কাজী মু'তাসিম বিল্লাহর সঙ্গে পড়ন্ত বিকেলে চায়ের চুমুকে চুমুকে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আলাপ জুড়ে দিলাম।

—শুনেছি আপনি আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। কিভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধে জড়িত হলেন আমাদের একটু বলবেন কী?

: মুক্তিযুদ্ধের প্রারম্ভে– মার্চ মাসে আমি ঢাকার যাত্রাবাড়ী মাদ্রাসাতে ছিলাম। পঁচিশে মার্চ রাত বারোটার দিকে পাক বাহিনীর তাণ্ডবে আমার ঘুম ভেঙে যায়। আরও দু-একজনসহ আমরা বারান্দায় এসে দেখি চেঁচামেচি। এসব দেখে পাকিস্তানিদের প্রতি এমন একটা ঘৃণা জন্মাল যে, তখন থেকেই আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম এদের উৎখাত করার জন্য যত রকমের চেষ্টা আছে আমি সব করব। ২৮ মার্চ মাদরাসা ছুটি দিয়ে তালা লাগিয়ে পায়ে হেঁটে মুন্সীগঞ্জ দিয়ে মতলব থানা হয়ে চাঁদপুর গেলাম। চাঁদপুর থেকে লঞ্চে ফরিদপুর, ফরিদপুর থেকে হেঁটে আমাদের বাড়ি যশোরে পৌঁছাই। আমার দায়িত্ব ছিল রাতে মুক্তিযোদ্ধাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা এবং যুবকদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করা। আমাদের তিন থানায় শান্তি কমিটির তিনটি অফিস ছিল। সেখানে আমার নামও ছিল। তারা আমাকে ধরার জন্য বহু চেষ্টা করেছে। আমি আত্মগোপনে ছিলাম।

—শান্তি কমিটিতে কারা ছিল?

: মুসলিম লীগার এবং জামায়াতিরা। হক্কানি আলেম সমাজ শান্তি কমিটিতে ছিলেন না। জামায়াতিদের প্ররোচনায় বিভ্রান্ত হয়ে কেউ কেউ হয়তো স্বাধীনতার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। প্রকৃত সত্য হলো, ওলামায়ে কেরাম মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে ছিলেন কিন্তু সক্রিয়ভাবে তারা খুব একটা সামনে আসেননি।

—হাফেজ্জি হুজুর বলেছিলেন, 'এ যুদ্ধ ইসলাম আর কুফরের যুদ্ধ নয়, এটা জালেম আর মজলুমের যুদ্ধ। পাকিস্তানিরা জালেম'– এ ব্যাপারে মন্তব্য করুন।

: ঠিক কথাই বলেছেন। পাকিস্তানিদের জুলুম ছিল সীমাহীন। এরকম নৃশংসতা এবং বর্বরতা দুনিয়ার আর কোথাও হয়েছে কি-না আমার জানা নেই। নিজের চোখে দেখা।

—স্বাধীনতার বিপক্ষে যারা অবস্থান নিয়েছিল বিশেষ করে জামায়াতিরা বলে যে, তারা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়নি বরং ভারতের আগ্রাসনকে প্রতিরোধ করার জন্য পাকিস্তানের পক্ষ নিয়েছিল...

: ভারত কোনো আগ্রাসনই করেনি। বাংলাদেশের প্রায় এক কোটি উদ্বাস্তু যখন ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে তখন তারা নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য এবং বিদেশের সাহায্য পাওয়ার জন্য এ যুদ্ধে জড়িয়েছে। এছাড়া যতক্ষণ পর্যন্ত বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার আবেদন না করেছে ততক্ষণ পর্যন্ত ভারত আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেনি।

—এ যুদ্ধে যারা প্রাণ দিয়েছে ইসলাম তাদের সম্পর্কে কী বলে?

: অবশ্যই শহীদ। কারণ হাদিসে আছে, 'মান কুতিলা দুনা মালিহি ওয়া ইলমিহি ফাহুয়া শাহীদুন'— তবে মুসলমান হতে হবে।

—বিরাঙ্গনারা?

: তারা মজলুমা। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখতে হবে তাদেরকে। তবে যেসব নারী সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে নিহত হয়েছে তাদেরকে নিহতই বলা হবে। কারণ ইসলাম নারীদের এভাবে যুদ্ধে যেতে বলেনি।

—বর্তমান সমাজে হুজুর বা আলেম মানেই রাজাকার, '৭১-এ আসলেই রাজাকার কারা ছিল আশা করি এ ব্যাপারে অসঙ্কোচ প্রকাশে দুরন্ত সাহস দেখাবেন।

: আলবদর, আলশামস্ ছিল জামায়াতিদের আর রাজাকারদের মধ্যে মুসলিম লীগের প্রভাবান্বিত কিছু লোক। সেখানে হয়তো ব্যক্তিগত পর্যায়ে কোনো কোনো আলেম ছিলেন কিন্তু সে সংখ্যা খুব কম। এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন। আসলে স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা না থাকার কারণে ওলামায়ে কেরাম এখন নিরপরাধভাবে মার খাচ্ছে, গালি খাচ্ছে। এছাড়া স্বাধীনতা-পরবর্তী কিছু কিছু আলেমের মধ্যে এ ব্যাপারে একটি উন্নাসিকতা ভাব লক্ষ করা যায়— এটাও একটা কারণ। আমি একজন সক্রিয় মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম। অথচ দেশের তৎকালীন পরিস্থিতির কারণে আমাদের যশোর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং তৎকালীন এমপি রওশান আলী তার প্যাডে লিখে আমাকে সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন যে, পথে যদি কেউ ধরে তাহলে এটা দেখাবেন। সেখানে তিনি লিখে দিয়েছিলেন, ইনি মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে কিছু করেননি বরং সপক্ষে যথেষ্ট কাজ করেছেন।

—আমরা একটি স্বাধীন দেশের গর্বিত নাগরিক এবং জাতি হিসেবেও স্বতন্ত্র। তো আমাদের জাতীয় দিবসগুলো ইসলামী ভাবধারায় পালন করতে সমস্যা কোথায়?

: ইসলামী ভাবধারায় হলে সমস্যা নেই। কিন্তু বর্তমানে যেভাবে হয় যেমন শহীদ দিবস। শহীদ দিবসে উচিত ছিল খতম পড়ে তাদের জন্য ইসালে সওয়াব দেয়া। আমরা যা করি এটা হলো একটা উল্লাস প্রকাশ। এর দ্বারা শহীদদের কোনো উপকার হয় না। এটা করাও কোনো দোষণীয় নয়। কিন্তু যেটা আসল করা দরকার ছিল সেটা থেকে আমরা দূরে রয়েছি।

—জাতীয় পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত, শহীদ মিনার, স্মৃতিসৌধ, শিখা চিরন্তন, শিখা অনির্বাণ, এক মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন, কামানে গোলা ছুড়ে শ্রদ্ধা বা সম্মান জানানো, প্রভাতফেরি, পহেলা বৈশাখ যে কোনোভাবেই হোক সাধারণ জনগণ এগুলোর সঙ্গে মিলে একাকার হয়ে গেছে– এ সম্পর্কে কিছু বলুন।

: এখানে কয়েকটি বিষয় আছে যেগুলো সম্পূর্ণ ইসলামী শরিয়ত পরিপন্থী। যেমন শিখা চিরন্তন, শিখা অনির্বাণ, স্মৃতিসৌধ। সেখানে গিয়ে ফুল দেয়া, নীরবে দাঁড়িয়ে থাকা, এগুলো পূজার মতো দেখায়। জাতীয় দিবসগুলোতে আমাদের মাদ্রাসা বন্ধ থাকে, জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।